ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1369-1374
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.142

সময়ের অভিঘাত এবং প্রত্নস্মৃতি: দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এবং 'জটায়ু' গল্পে পুরাণের পুনর্পাঠ

শ্রেয়সী মল্লিক, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In post-World War II Bengali literature, the consciousness of time and the crisis of existence emerged with particular significance. This era was marked by political instability, the trauma of Partition, the refugee crisis, and the struggles of middle-class life. Dipendranath Bandyopadhyay—both a writer and a leftist political activist—reflected these crises in his fiction with a deep sociological perspective. His short stories *"Ashwamedher Ghora"* and *"Jatayu"* interweave mythological elements with the crises of modern life to construct a new narrative discourse.

In *"Ashwamedher Ghora"* (The Horse of Ashwamedha), the metaphor of the Vedic sacrificial horse is used in the context of a married couple, Rekha and Kanchan, to explore the weariness of middle-class life, the crisis of social recognition, and urban loneliness. While the galloping horse once symbolized the glory of imperial conquest, here it becomes a metaphor for the aimless, chaotic pace of city life. In *"Jatayu"*, the wounded wings of the mythological bird Jatayu merge with the rootless existence of a morally decaying time.

This paper discusses how Dipendranath Bandyopadhyay's dialectical perspective transforms myth into a narrative intimately connected with the crises of modern times.

Keywords: Myth, Crisis, Ashwamedha, Jatayu, Existence.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকারে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন,

> "আমার সময়কে সৃজনশীলভাবে ধরে রাখা, আমার কথাগুলো জানানো।...আমি জগৎ ও জীবনকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাই। আমি মনে করি একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই জগৎ ও জীবনের সমগ্রতাকে, তার প্রকৃত ঐতিহ্যকে, আত্মস্থা করা ও সৃজনশীলভাবে নির্মাণ করা সম্ভব।"[১]

খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু জীবনের অসহায়তা অনিশ্চয়তা মিলিয়ে বিষ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশক ছিল জীবনস্বপ্ন ধ্বংসের কালবেলা। এই ত্রস্ত সময় পরিসর অস্তিত্ব সংকটে তাড়িত করেছিল মানুষকে। কেন্দ্রচ্যুত একদল মানুষ জীবনে আঘাত পেয়ে জীবনকেই ভয় করতে শুরু করেছিলেন। এই সময়পর্বই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মী দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার উর্বরতম অধ্যায়। সমকালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে নিজেকে জড়িয়েছিলেন তিনি এবং এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। পরিবারে কংগ্রেসী রাজনীতির আবহ ছিল। পিতামহ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বাবা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের সহযোগী।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই বামপন্থী ছাত্র সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। বিশ শতকের চারের দশক থেকে যে বামপন্থী আন্দোলন দানা বাধছিল পাঁচের দশকে তা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একের পর এক খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলনে বামপন্থীরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উত্তাল এবং এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছেন লেখক। পাশাপাশি চলছিল সাহিত্য রচনার কাজ। ছাত্রজীবনের এই অধ্যায়টি ধরা পড়েছে তাঁর 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে। ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন দীপেন্দ্রনাথ। পরবর্তী সময়ে বিমল করের 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। কালানুসারী জীবনভাবনা থেকে সাহিত্যে নিজের 'বর্তমান সময়'কে ধরতে চেয়েছেন তিনি। বর্তমানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পুরাণের কথা চিত্রকে উপস্থাপন করার রীতি কথাসাহিত্যে প্রচলিত। পুরাণের ব্যাপক আবেদন জনমানসে সহজেই অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সাংস্কৃতিক অভিযোজনের মাধ্যম হিসেবেও পুরাণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।[২] আবার পুরাণ কথা সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি হিসেবেও বিবেচ্য। বিশেষ করে সংকটের সময়ে, কোনও কঠিন নির্বাচনের প্রশ্নে মানুষ দৃষ্টান্ত খুঁজতে চায় মহাকাব্য-পুরাকথার জগত থেকে, পেতে চায় নির্ভরভূমি। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে জনপরিসরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরাকথার এই গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এবং 'জটায়ু' গল্পে পুরাকথার প্রত্ন-ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিকের সংযোগসূত্রটিকেই যেন বিচার করতে চেয়েছেন লেখক।

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০-এ শারদীয় ছোটোগল্প পত্রিকায়। পড়ে বিমল করের 'এক দশকে' গল্প সংকলনে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। শহর কলকাতার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে গল্পটি। দীপেন্দ্রনাথের শৈশব, বাল্য, যৌবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছিল উত্তর কলকাতায়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিয়ালদার কাছে তাঁদের পারিবারিক বসবাস ছিল। কলেজ জীবনের শুরু থেকেই ছাত্র আন্দোলনের সূত্রে, কখনো বা সাহিত্য আড্ডার আকর্ষণে গোটা কলকাতা শহরটাই হয়ে ওঠে তাঁর বিহারক্ষেত্র। ফলত দীপেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প, উপন্যাসে কলকাতা শহর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে এই শহর কেবল প্রেক্ষাপট হয়েই থাকে না, যেন প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে। গল্পের আখ্যান আবর্তিত হয়েছে একটি দিনের একটি খণ্ড সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং এই সময়টি অতিবাহিত হয়েছে পথের উপর। প্রধান দুই চরিত্র রেখা এবং কাঞ্চনের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিনের দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘটনা নিয়ে এই গল্প। যে পথের উপর এই সময়টুকু যাপন করেছে তারা সেই পথ কোথাও গিয়ে পৌঁছয় না বা কোথাও পৌঁছে দেয় না এই দম্পতিকে। পথের শেষে থাকে না কোনও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সম্ভাবনা। অথচ এই যাত্রাপথে বারবার ফিরে ফিরে আসে একটি ঘরের স্বপ্ন, আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা। সবমিলিয়ে অদ্ভুত এক বৈপরীত্য, এক আততি আচ্ছন্ন করে রাখে গল্পটিকে। গল্পের শুরুতেই সানাইয়ে চন্দ্রকোশার সুরের দিকে রেখার শ্রুতি আকর্ষণ করেছে কাঞ্চন। ধ্রুপদী সংগীত প্রেমী দীপেন্দ্রনাথের প্রক্ষেপ ঘটেছে কাঞ্চন চরিত্রে। সুরের অনুষঙ্গে আখ্যান পাড়ি দেয় এক বছর আগে-

> "কাঞ্চন স্পষ্ট শুনল সানাই বাজছে। চন্দ্রকোশ। সেই আমরা রেস্তোরাঁয়-সুকুমার দুটো মালা-আর প্রফুল্ল সকলকে হতবাক করে এক প্যাকেট সিঁদুর, দুটো লোহার নোয়া-আর সেই মুহূর্তে প্রথম রেখাকে অপরিচিত মনে হয়েছিল।...সকলের তাড়া খেয়ে আমি রেখার ঠাণ্ডা কপালে-মুখের দিকে তাকাতে সাহস-কেন আঙুল দিয়ে সিঁদুর লাগাতে হয়-প্রফুল্ল বকেছিল আর রেখা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ফেলেছিল।"[৩]

-টুকরো টুকরো বাক্য মিলিয়ে একটা কোলাজ, যেন সমস্ত শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ মিলিয়ে বিয়ের আবহ তৈরি করছে। সানাইয়ের সুরে খুব যত্ন করে যে আখ্যানে রোম্যান্টিক আবহের বুনন চলছিল তা মুহূর্তেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় হুবির বলদের মালা চিবোনোর দৃশ্যে। সময়ই যেন প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে ঐ হুবির বলদের মধ্যে, যার কোনও সূক্ষ্মতা নেই, সমস্ত ভালোলাগা-ভালোবাসাকে গ্রাস করে সে। কাঞ্চনের চিন্তাস্রোতের মধ্যে দিয়ে ঘটমান বর্তমান থেকে এক বছর আগে তার বিয়ের দিন এবং তার পরের দিনের স্মৃতি এসেছে অথচ আখ্যানের চলনের কোনো অসুবিধে হয়নি। কাঞ্চনের চেতনাপ্রবাহ অবলম্বন করে ধারাবাহিকতা রক্ষার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন কথক। রেখা কাঞ্চনের সম্পর্কে আইনি শিলমোহর পড়লেও সমাজে তাদের অবস্থান বদলায়নি। কাঞ্চনের পক্ষে তাদের দারিদ্র্যের সংসারে হঠাৎ করে রেখাকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। রেখাও জাত্যাভিমান আঁকড়ে থাকা বাবাকে আঘাত করতে অপারগ। যাঁদের জন্য এই

ত্যাগস্বীকার সেই পরিবারের মানুষদের প্রতি ভেতরে ভেতরে চাপা বিদ্বেষও পোষণ করে এই দম্পতি। এই বাধা না থাকলে তাদের জীবন অনেক বেশি সাবলীল হতে পারত। গত এক বছরেও সমাজের কাছে তাদের সম্পর্ক বদলায়নি অথচ তাদের পরিপার্শ্ব, কলকাতা শহর ক্রমাগতই বদলে যাচ্ছে-

> "হাঁটার শেষ নেই। এক পথে পা ফেলা। রাস্তাটা চোখের সামনে পাল্টাতে দেখি। কলকাতা রোজ পালটায়। আমরা শুধু রাস্তাটুকুর খবর রাখি। হাঁটতে হাঁটতে বড়জোর ময়দান অব্দি যাব। বড়জোর চা খাবো এক পেয়ালা। আলো আর অন্ধকারের সমারোহ দেখব। তারপর বাস ধরব।...তারপর বাড়ি যাব। তারপর রাত্রি। তারপর দিন। আর দিনে হাঁটতে হাঁটতে দেখব রাস্তাটা পালটাচ্ছে। কলকাতা কত তাড়াতাড়ি পালটায়।"[৪]

কাঞ্চনের স্বগত ভাবনায় উঠে আসে কলকাতার পরিবর্তন এবং তাদের জীবনের পরিবর্তনহীনতার কথা। যে সময়ের গল্প সে সময় কলকাতা শহর জুড়ে ভাঙাচোড়ার খেলা চলছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক সেনেট হল ভেঙে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবন তৈরি হবে। ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনে গড়ে উঠবে স্টেডিয়াম। বিধানচন্দ্র রায়ের নগরায়ণের পরিকল্পনামাফিক কলকাতাকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস শুরু হয়েছে তখন। বারবার এই গল্পে পুরনো পাঠকৃতি ফিরে ফিরে আসে রেখা কাঞ্চনের কথোপকথনে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা থেকে প্রবোধ সান্যালের নায়ক কিংবা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নায়িকার ছকবাঁধা ভাবমূর্তি কাঞ্চন রেখার সমসময়ের সঙ্গে যেন ঠিক মানানসই নয়। অথচ নতুন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার স্বাধীনতা বা সাহস কোনটিই তাদের নেই। কাঞ্চন তথাকথিত শহুরে বুদ্ধিজীবী যুবকের প্রতিনিধি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বিধা দ্বন্দ্বের প্রতিফলন তার চরিত্রে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুল কেনার মানসিকতা তার নেই। রেখার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে করে যাওয়াও তার কাছে একটু অস্বস্তিকর। গঙ্গার কিনারা দিয়ে তারা ঘুরবে। এটুকুই তাদের নিজস্ব সময়, একান্ত নিভৃতি। আখ্যান পরিসর যেহেতু পথেই সীমাবদ্ধ তাই পথের মাঝে বারবারই আসে ট্রাফিক সিগনাল, সাবধানে পথ চলুন সপ্তাহের অনুষঙ্গ। সবকিছুই পথ যাত্রীদের সাবধান করার জন্য। রেখা কাঞ্চনের বিবাহিত জীবনেও সাবধান হওয়ার ইঙ্গিত চলে আসে

> "রেখা এই আলো, এই অরণ্য, এই পরিপার্শ্বকে ভয় পাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়িতে আমার সঙ্গে উঠেছে তাই ভয় পাচ্ছে। আমার সঙ্গে উঠে ভয় পাচ্ছে। ফিটনের দু'পাশ খোলা। সত্যিই চারদিকে অমৃতের অজস্র সন্তান। কে না কে দেখছে জানি না। রেখার পরিবার আছে, সমাজ আছে, আমি একটা পুরুষ। ওহো আমি পুরুষ।"[৫]

রেখার এই সংকট কাঞ্চনকে তার পুরুষত্ব সম্পর্কে একটা বোধ দেয়। চারপাশে অনেক অনুসন্ধিৎসু চোখ, অনেক কটাক্ষ। এর পরের অংশেই রয়েছে একটি বিজ্ঞাপন

> "আলোর দিকে মুখ রাখুন। হলুদের পর সবুজ আলো জ্বললে দুই দাগের মধ্য দিয়ে সাবধানে রাস্তা পার হন। মনে রাখবেন জীবন অমূল্য। সামান্য ভুলের মাশুল ভয়ানক।"[৬]

এই নির্দেশ যেন সমস্ত হিসেব মেনে জীবনের পথ চলারও ইঙ্গিত দেয়। এমন একটি সময়ে রেখা কাঞ্চনের প্রেম যাপন যে সময় ট্রাফিক সিগনালের নির্দেশের মতোই নিরুপদ্রব একটি রাস্তা জীবনের জন্য স্থির করে দিতে চায়, বজায় রাখতে চায় স্থিতাবস্থা।

ঘোড়ার গাড়িতে পর্দা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের সোচ্চার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় রেখা কাঞ্চন। বিবাহিত জীবনে যে নিভৃতি একান্ত কাম্য ছিল, আজ সেই সেই অবকাশটুকু পাওয়া গেল। নির্জনতার অভাবে এর আগে ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারেনি তারা, নিজেদের গভীরতম আবেগকে পরিহাসের ছলে এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজকের এই সঙ্গোপনে কাঞ্চন রেখাকে 'বউ' বলে ডেকেছে, তার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছে 'স্বামীন' সম্বোধন। আধুনিক শিক্ষিত মনন নিয়েও দাম্পত্যের পুরনো সংস্কারগুলিকেই লালন করে তারা। সেই সঙ্গে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকেও মুক্তি নেই। কাঞ্চনের ভাবনাস্রোতে ভেসে আসে সেই স্ববিরোধ-

> "ছুঁতে ইচ্ছে করছে। খোঁপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মত চুলগুলি যদি রেখার মুখে বুকে ছড়িয়ে দি। হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম? আমার রক্ত, আমার মন বৃষ্টি হতে চায়। একটা কথা ধ্রুব বুঝেছি। বৈষ্ণব কবিরা যৌবন সম্পর্কে যে উল্লাস প্রকাশ করেছেন,

তা মিথ্যে। আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না, আমি পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।"[৭]

বহু আকাঙ্খিত নিরালায়, চলমান সফরে অশ্বক্ষুরের ধ্বনি যেন অবচেতনায় এক প্রত্ন স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে, অনুভূত হয় পুরাণ ও ইতিহাসের উত্তরাধিকার-

"অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড়-কন্যা আর্য-ঘোড়সওয়ারের পায়ের তলায় হা হা করে কেঁদে উঠল। তারপর চেঙ্গিস খাঁর অশ্বারোহী দল শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লিতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এমন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঝে পাটোয়ারি বুদ্ধিতে বাজি দৌড়য়। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল, মাত্র আড়াই টাকার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে।"[৮]

যুদ্ধ, যৌনতা এবং দিগ্বিজয়ের প্রতীক ঘোড়া। বহুমাত্রিক তাৎপর্যে আখ্যানে প্রতীকটিকে ব্যবহার করেছেন লেখক। অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজারা পুরুষ রক্ষীসহ বিশেষ লক্ষণযুক্ত ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দিতেন দিগ্বিজয়ে। এক বছর পর ঘোড়া ফিরে এলে অথবা ঘোড়ার গতিরোধকারী শক্তিকে পরাজিত করে ঘোড়াকে ফিরিয়ে আনার পর শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাকে হত্যা করে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত। অশ্বটিকে কীভাবে হত্যা করতে হবে তার বর্ণনা পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। উখা নামক পাত্রে ঘোড়ার মাংস রান্না করে একটি টুকরো যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গ করার পর অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করা হত।[৯] নৃতত্ত্ববিদদের মতে শিকারজীবী মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও ভক্ষ্য পশুর ভূমিকা ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে বীর পুত্রের কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হত। মৃত ঘোড়ার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতে হত রাজার পাটরানীকে। অর্থাৎ একটি যৌনতার একটি উল্লাসময় উদযাপনও জড়িয়ে রয়েছে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই এই উচ্চকিত উদযাপন রাজতন্ত্রের জন্য, যজ্ঞাশ্ব তখন মৃত, নিথর। এরই অনুষঙ্গে লেখক দেখান কাঞ্চনের অপ্রকাশ্য, অবদমিত যৌনতার শরীরী প্রকাশের শব্দ-ছবি-

"আমার এই শরীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে।"[১০]

যেখান থেকে অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বের যাত্রা শুরু হয় সেখানেই ফিরে আসতে হয় তাকে, বিজয়যাত্রার শেষে তার জন্য নির্ধারিত থাকে মৃত্যুদণ্ড। ইতিহাসের রথচক্রে ঘোড়ার ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে। আজ সে আর পৌরুষ কিংবা শৌর্য-বীর্যের ধ্বজা বহন করে না। কিন্তু বদল ঘটেনি তার অনিবার্য নিয়তিটির। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় দেখান যে সময়ে রেখা কাঞ্চনের মতো দুটি তরুণ প্রাণ বেঁচে আছে সেই সময় হয়ত একদিন তাদের গ্রাস করে নেবে। জীবনের দিগ্বিজয়ে তাদের এই যাত্রার পরিসমাপ্তিতে হয়ত আত্মাহুতি ছাড়া কিছুই বাকি থাকবে না। গল্প শুরু হয়েছিল সানাইয়ের সুরে, আর গল্পের শেষে দরকষাকষির সূত্রে গাড়োয়ান যখন বলে "ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না?"[১১]- তখন যেন এক লহমায় সমস্ত সুর মুছে যায়। সময়ের এক আশ্চর্য অবনমন, মজ্জাগত স্থূলতাই উদগ্র হয়ে ওঠে। বিয়ে থেকে প্রথম বিবাহবার্ষিকী- এক বছরের আবর্তনে যজ্ঞাশ্বের মতোই এই দম্পতির জন্যও পড়ে থাকে কেবল আশ্রয়হীনতা।

দীপেন্দ্রনাথের জটায়ু গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল বিমল কর সম্পাদিত 'ছোটগল্প নতুন রীতি' পত্রিকায়, ১৯৬০ সালে। গল্পের আখ্যানকাল ১৯৪৬ এর দাঙ্গাকে ছুঁয়ে ৪৭ এর স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। লেখকের পিতৃপুরুষের বাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরে। ছেলেবেলার পর ১৯৫৪ এবং ১৯৭২-এ দু'বার পূর্ববঙ্গে গিয়েছেন তিনি। বিশেষকরে ১৯৫৪-য় সাহিত্যিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে যাত্রা এবং উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতার সূত্রে দাঙ্গা ও দেশভাগের অভিঘাত উঠে এসেছে তাঁর কলমে। জটায়ুর পৌরাণিক পরিচয় হল- বায়ু-বেগ-গামী পাখি বিশেষ। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যসারথির পুত্র জটায়ু।[১২] এ গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র নিত্যচরণের সঙ্গে জটায়ুর দেহগত সাদৃশ্য একটিই, নিত্যচরণের হাত দুটি কনুই পর্যন্ত কাটা। গল্পের ঘটমান বর্তমানটুকু গড়ে উঠেছে এক অমাবস্যার রাতে। অন্ধকারের বর্ণনা দিয়ে গল্প শুরু হয়-

"আজ জোনাকিও ছিল না। এই অমাবস্যায় নাকি জোনাকি জ্বলে না। অন্ধকারটা কাদার মতো থিকথিক করছিল। কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা, কোথাও আলো অন্ধকার কিছু নেই। পৌষ মাস, হিম পড়ছে। যেন ফোঁটা ফোঁটা অন্ধকার।"[১৩]

অবয়বহীন, বিমূর্ত অন্ধকারকে যেন শরীর দেওয়া হয়েছে। কার্যত এই অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে আরও অনেক অন্ধকারের স্মৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। ব্যতিক্রমহীন গাঢ় অন্ধকারে ট্রেনের যান্ত্রিক শব্দ, ঝিঁঝিঁর ডাক, অন্ধকারে মিশে থাকা গাছপালা এবং হ্যাজাকের উগ্র আলো- সবমিলিয়ে গ্রাম্য প্রকৃতি বর্ণনার রোম্যান্টিক ঐতিহ্য ভেঙে দেন লেখক। ভয়ঙ্কর কিছুর প্রতীক্ষায় সমস্ত আবহটি যেন থমথম করতে থাকে। গ্রাম ছাড়িয়ে শ্মশান, সেখানে চলছে কালীপুজোর আয়োজন। এই পুজোর একটি বিশেষত্ব রয়েছে। দেবীমূর্তির সামনে মাথায় ও দাঁতে পেতলের মালসায় আগুন নিয়ে একটি বিশেষ ছন্দে নিত্যচরণ নাচ করবে-

> "আগুনের ভেতর নাচবে। আগুন বয়ে নাচবে। নেত্যচরণ আগুন হয়ে যাবে।"[১৪]

এই নাচ দেখতে এসেছে নিত্যচরণের স্ত্রী দুর্গা। সুপুরি পাচার করতে গিয়ে রেলের চাকায় দুটি হাত কাটা পড়েছে নিত্যচরণের। সংসার চালানোর তাড়ণায় গ্রাম থেকে শহরের হোটেলে গিয়ে দুর্গাকে বেছে নিতে হয়েছে দেহ ব্যবসার পথ। আখ্যানের চলন রৈখিক বা ধারাবাহিক নয়, কিছুটা বর্তমান এবং তার সঙ্গে দুর্গার স্মৃতি আর ভাবনার স্রোত মিলেমিশে যায়। দুর্গার বর্তমান, তার সাম্প্রতিক অতীত এবং আরেকটু বিগত ফেলে আসা অতীত মিলিয়ে সময়ের বিন্যাসটি জটিল হয়ে ওঠে। দুর্গার ভয়কে কেন্দ্র করে তার চিন্তাস্রোতের শুরু-

> "পরপর মুখগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও চেহারাই স্পষ্ট নয়। কাউকেই বিশেষভাবে মনে পড়ে না। অনির্দিষ্ট একটা অবয়ব অস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়।"[১৫]

পেশার কারণে নিজের কাছেই সংকুচিত হয়ে থাকে দুর্গা। পুরুষের সমগ্র অবয়ব তার কাছে অর্থহীন। সে কেবল পুরুষের হাতে দলিত হয়, মঠিত হয়, মর্দিত হয়। তাই বারবার একটি আসুরিক হাতের ছবি ফিরে ফিরে আসে, যে হাত "তার বুকে চিমটি কাটে, তারপর গলা টিপে ধরে।"[১৬] দুর্গা চায় না তার শহুরে পরিচয় গ্রামে কেউ জানুক। ফলে এক অদ্ভুত ভয় সবসময় তাড়া করে তাকে। নিত্যচরণ আগুনের মধ্যে নাচছে ঠিকই, কিন্তু দুর্গাও রয়েছে এক অদৃশ্য বহ্নিচক্রের মধ্যে, সেখানে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা আরও অনেক বেশি কঠিন।

আগুনের ছবি দেখতে দেখতে অতীতের একটি আগুনে ফিরে গিয়েছে দুর্গা। সে আগুন দেশভাগের আগুন, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের আগুন। তাদের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। বাবাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল আগুনে। অত্যাচারীদের হাতে ধর্ষিতা হতে হয়েছিল দুর্গা ও তার মাকে। পালিয়ে এসে নিত্যচরণের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল দুর্গা। তাদের সুখী, প্রায় নিশ্চিন্ত দাম্পত্যে ফিরে ফিরে আসত সেই কর্কশ সর্বগ্রাসী হাতের ভয়-

> "সেই হাতটার ভয়ে মরি! আমি হাতটাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। ফাটা ফাটা কর্কশ তালু, কালো কালো নখ, কেন্নোর মতো ফুলে ওঠা শিরা। আমার নতুন আশ্রয়টি দুমড়ে দিতে চায়।"[১৭]

অতীত অবমাননার স্মৃতি পিছু ছাড়ে না কিছুতেই। প্রথম বেড়ায় যখন আগুন লাগে, দুর্গার মনে পড়েছিল দাঙ্গার কথা। এবার দ্বিতীয় বেড়ায় আগুন ধরল-

> "অমানুষিক কৌশলে নিত্য দ্বিতীয় বেড়াটায় দপ্ করে আগুন জ্বালল। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দুটো আগুনের বেড়া গোল হয়ে জ্বলছে। মধ্যিখানে নিত্য নাচছে।"[১৮]

দাঙ্গার আগুন ছিল বাইরের আগুন, তা অতিক্রম করে দাম্পত্য সংসারে প্রবেশ করেছিল দুর্গা। নিত্যচরণের হাত কাটা পড়ার পর সংসারের বেড়াতেও লাগল অভাবের আগুন। সেই আগুন দুর্গাকে টেনে আনল আরও একটি অলাতচক্রে- রোজগারের আগুনের মধ্যে। চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে আগুন লাগে তৃতীয় বেড়ায়। আগুনের তিন বেষ্টনী যেন এক হয়ে যায়-দেশভাগ, ট্রেনে নিত্যচরণের হাত কাটা, দুর্গার আদিম বৃত্তি গ্রহণ। যত আগুন, তত ধোঁয়া, ততই কালো- ধ্বস্ত সময় গ্লানির অন্ধকার মেখে দাঁড়িয়ে আছে, সেটিই হয়ত কালীমূর্তির লম্বা জিভের মতো সব স্বাভাবিকতাকে গ্রাস করতে চায়। পুরাণ-পাখি জটায়ু বাঁচাতে চেয়েছিল অপহৃত সীতাকে। কিন্তু রাবণের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নপক্ষ হতে হয়েছিল তাকে। একটি অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্যর্থতার যন্ত্রণা নিয়েই তাকে প্রাণপাত করতে হয়। সীতাকে হরণ করে দক্ষিণদিকে যাত্রা করেছে রাবণ, রামচন্দ্রকে এই সংবাদটুকু দিয়েই জটায়ুর মৃত্যু হয়েছিল। দুর্গাকে আগুন থেকে রক্ষা করতে আসেনি পুরাণের কোনও বীর পুরুষ। তথাকথিত এই আধুনিক সময়ে মেয়েদের বাঁচানোর জন্য দৈবযোগ নেই। নিত্যচরণ চেষ্টা করেছিল প্রতিকূল সময়ের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে। জটায়ুর মতোই দুর্গাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু "লোহার চাকা একটা কবজি আর একটি ডানা কামড়ে ছিঁড়ে নিল।"[১৯] সময়ের মারণ কামড় শুধু নিত্যচরণকেই পঙ্গু করেনি, দুর্গার অস্তিত্বের একটি অংশকেও হত্যা করেছে। ত্রাসের এই জীবনে সে আর

কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারছে না। কিন্তু সবকিছুর পরেও নিত্যচরণ নাচে। আগুন থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হয়ত নিজেই আগুন হয়ে যাওয়া, জীবন যুদ্ধকে মেনে নেওয়া। আগুন, নাচ, নিত্যচরণ সবই তাই এ গল্পে জীবন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। সময়, রাজনীতি এবং আত্মগ্লানির আগুন মিলিয়ে একেবারে শেষ গণ্ডিতে পৌঁছে যেন সত্যের আগুন জ্বলে ওঠে। দুর্গা তার জীবন সত্যকে প্রত্যক্ষ করে নিত্যচরণের মধ্যে। আগুন যেমন খাদকে পুড়িয়ে সোনাটুকুকে রাখে তেমনই সমস্ত যন্ত্রণার পরেও যে জিজীবিষা বেঁচে থাকে তাকেই দুর্গা দেখতে পায় ঐ ছিন্নপাখ আগুন পাখির মধ্যে। জটায়ুর মতোই সে চেষ্টা করে বাঁচাতে, আগলে রাখতে অথচ বারবার ব্যর্থ হয়। আর ব্যর্থতার অভিজ্ঞান ধারণ করেও আগুনের মধ্যে নাচে, জটায়ু যেন ফিনিক্স হয়ে নবজন্ম পেতে চায়।

'ছোটগল্প: নূতন রীতি' আন্দোলনের শরিক ছিলেন দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাহ্য ঘটনা পরম্পরা দিয়ে কাহিনি গন্থনকে শিল্পময় গল্প বলতে কুণ্ঠিত ছিলেন এই আন্দোলনকারীরা। কৌতুহল উদ্রেক, উত্তেজনার নিরসন এবং সর্বোপরি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণের স্থূল চাহিদা থেকে গল্পকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এবং 'জটায়ু' গল্পে পরিণতির দিকে কোনো যাত্রা নেই। দুটি গল্পের নামকরণেই পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যঞ্জিত হয়েছে। পুরাণের জগত বৃত্তাকার, সামঞ্জস্যে পূর্ণ। অশ্বমেধের ঘোড়া গল্পে এই সামঞ্জস্য বারবার গড়ে উঠতে চায় সাঙ্গিতীক ব্যঞ্জনায়, চন্দ্রকোষ, বিসমিল্লার সানাই, বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে। কিন্তু এই সুরের আবহ বারবার ছিঁড়ে যায় ট্রাফিক সিগনালের বিপদবাহী লাল আলোয়, 'সাবধানে পথ চলুন'-এর কর্কশ বিজ্ঞাপনে কিংবা গাড়োয়ানের কটু বাক্যবাণে। বোঝা যায় আজকের পৃথিবীতে ভালোবাসাকে সাবধানী হতে হবে। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই বর্তমানের রাজপথে উদ্দামগতি প্রেমের পরিণতি বড়ো ভয়ংকর। আশ্রয়হীনতার সূত্রে একই ছেদবিন্দুতে এসে মিশে যায় পুরাণ ও বর্তমান পরিসর। অন্যদিকে 'জটায়ু' গল্পে অন্ধকারে, ধোঁয়ায় নির্বাসিত অস্তিত্ব বীর হতে চায়। ছিন্ন পক্ষের বেদনা নিয়েও নাচের মধ্যে দিয়ে নিত্যচরণ যেন আহরণ করে নির্যাতিত স্বপ্নের মুক্তি ছন্দ, ঠিক যেভাবে সীতা উদ্ধারের দিক নির্দেশে মুমূর্ষু জটায়ু অপনোদন করতে চেয়েছিল ব্যর্থ বীরত্বের অসহ্য গ্লানি। এভাবেই বিষয় ভাবনা এবং পরিণতিতে পুরাণ কথার অনুষঙ্গ যেন সংকটগ্রস্ত সময়ে নতুন অবয়বে মূর্ত হয়ে ওঠে দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, দেবেশ (সম্পা) । পরিচয় পত্রিকা। ৪৮ বর্ষ, সংখ্যা ৭ম ও ৮ম, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, কলকাতা: পরিচয় কার্যালয়, ১৯৭৯, পৃ: ১৪৯।

২. Nath, Vijay. Puranas and Acculturation. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2001. Page- 137.

৩. চক্রবর্তী, অনিশ্চয় (সম্পা) । গল্পসমগ্র দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, একুশ শতক, ২০০৫, পৃ: ৩০০।

৪. তদেব, পৃ: ২৯৯-৩০০।

৫. তদেব, পৃ: ৩০৪।

৬. তদেব, পৃ: ৩০৪।

৭. তদেব, পৃ: ৩০৬।

৮. তদেব, পৃ: ৩০৭।

৯. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। ধর্ম ও সংস্কৃতি। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ: ৬১।

১০. চক্রবর্তী, অনিশ্চয় (সম্পা) । গল্পসমগ্র দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, একুশ শতক, ২০০৫, পৃ: ৩০৬-৩০৭।

১১. তদেব, পৃ: ৩০৭।

১২. সরকার, সুধীরচন্দ্র। পৌরাণিক অভিধা। কলকাতা, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১২, পৃ: ১৭৩-১৭৪।

১৩. চক্রবর্তী, অনিশ্চয় (সম্পা) । গল্পসমগ্র দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, একুশ শতক, ২০০৫, পৃ: ২৭৫।

১৪. তদেব, পৃ: ২৭৫।

১৫. তদেব, পৃ: ২৭৬।

১৬. তদেব, পৃ: ২৭৬।

১৭. তদেব, পৃ: ২৭৮।

১৮. তদেব, পৃ: ২৭৮।

১৯. তদেব, পৃ: ২৭৯।